ইকুইটিবিডি অবস্থানপত্র, জুন-২০১৮

কন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক খাতের সুশাসন চাই

ভ্যাট নয়, আয়করই হওয়া উচিত রাজন্ব আয়ের মূল উৎস

ক. প্রেক্ষাপট ঃ

সরকার আগামী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য সম্ভাব্য ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার বাজেট ঘোষনা করতে যাচ্ছে, যা চলতি ২০১৭-১৮ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৫% বেশি। এ ছাড়া আগামী অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০ কোটি টাকা যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩১% বেশি। মোট উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ১লাখ ৭৯ হাজার ৬৬৯ কোটি টাকা যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার করা হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা, অন্যদিকে অনুনন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২লাখ ৫১ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা, যা মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৪০% বেশি এবং মোট বাজেটের ৫৪%। চলতি অর্থবছরের ন্যয় আগামী অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি ধরা হবে মোট জিডিপির প্রায় ৫%। এই ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্য সরকারকে বৈদেশিক ঋণ, আভ্যন্তরিন উৎস (রাজস্ব ও অন্যান্য), ব্যাংক ঋণ এবং সঞ্চয়পত্র ও বন্ড বিক্রির উপর নির্ভর করতে হয়। এতে করে সুদ পরিশোধের পরিমান আনেক বেড়ে যাবে। **প্রতি বছর গড়ে ১৫০ কোটি ডলার বিদেশি ঋনের সুদ পরিশোধ করতে হয়।** প্রতিবছর সরকার রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে থাকে তা কখনও অর্জন কতে পারেনা।

র্অথমন্ত্রী নতুন বাজেটে যে রাজস্বনীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছে, তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে যেমন ভ্যাট হার বাড়ানো (৯টি স্তরের পরিবর্তে ৫টি স্তর), ভর্তুকি কমানো, আমদানি শুল্ক কমানো ইত্যাদি। অন্যদিকে নতুন ভ্যাট হার সহ অন্যান্য করের হার ও এর পরিধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে, ফলে সকল মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র ভোক্তা শ্রেনীকে কর দিতে হবে। **রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা চলতি অর্থবছরের (২০১৭-১৮) চেয়ে ৩৩.৭% বেশি, আয়কর আদায় ২৯.৬% বেশি, কর্পোরেট কর আদায় ১৫.৯% এবং ব্যক্তিকর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫৮.৪% বেশি দেয়া হয়েছে**। এখানে ভ্যাট এবং ব্যক্তিকর আদায়ে বেশি জোর দেয়া হযেছে, ফলে একদিকে জনগণের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত/নিম্ন মধ্যবিত্ত/গরীরের কাঁধে যেমন করের বোঝা চাপানো হচ্ছে তেমনি ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে জীবনযাত্রা ব্যয় আরও বেশী বাড়ানো হচ্ছে।

সুতরাং কর আদায়ে সরকারকে কৌশলী হতে হবে এবং কর ন্যায্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ সরকারকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ ও তা পুনঃবন্টকারীর ভূমিকা নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ধনীব্যক্তিদের কাছ থেকে বেশী কর আদায় করতে হবে এবং এর অর্থ সাধারন ও গরীব জনগনের কল্যানে ব্যায় করতে হবে। বিশেষ করে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সেবায় বরাদ্দ বাড়িয়ে এদের জীবন যাত্রা মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

খ. রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি এবং অর্থ পাচার বড় বাধা

১. অপ্রদর্শিত অর্থের রাজনৈতিক অর্থনীতি:

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বা Under Ground Economy। সরকার এই অপ্রদর্শিত অর্থনৈতি কিভাবে মোকাবেলা করবে তার তার ফলপ্রসু কোন উদ্যোগ না নিয়ে বরং সরকার প্রতি বছর বাজেটের পুর্বে অথবা বাজেটের পরবর্তী সময়ে কর আদায়ের নামে এ সকল অনৈতিক ব্যবসায়ীদেরকে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিচ্ছে। এতে করে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মধ্যে এক ধরনের দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়মকে উৎসাহিত করার প্রয়াস সৃষ্টি হচ্ছে যা অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আরও বিস্তার ঘটাতে সহায়ক হবে এবং এতে করে প্রকৃত কর প্রদানকারীরা নিরুৎসাহিত হচ্ছে। **বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ পরিচালিত পৃথক গবেষণায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির পরিমাণ মোট জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এর গড় হার বিবেচনা করলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছায়া অর্থনীতির (জিডিপি হিসেবে) পরিমাণ ছিল ১০,৭৫৮ বিলিয়ন টাকা** এবং যা উক্ত বছরের জাতীয় বাজেটের প্রায চার গুন। এক্ষেত্রে যদি কালো অর্থনৈতিক কার্যাবলীসমুহকে উম্মোচন করা যায় তাহলে একদিকে যেমন জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে, তেমনি অন্যদিকে উম্মোচিত অর্থনীতির কারনে প্রত্যক্ষ কর আদায় হারও কাংখিত পরিমানে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এ কর্মকান্ডের প্রভাবে সরকারের ঘাটতি বাজেটের আশংকা হ্রাস পাবে এবং পাশাপাশি দেশী-বিদেশী ঋণ গ্রহনের ঝুঁকিও কমতে পারে।

অপ্রদর্শিত অর্থের উৎস:

অবৈধ বা অনৈতিক কর্মকান্ড	বৈধ কিন্তু জাতীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়
ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাচালান, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, সম্পত্তি দখল, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসান, বেসরকারীকরণ, শিল্প স্থাপনের জন্য নেওয়া ঋণের অর্থ লুট, নগদ সহায়তা ও কর অবকাশ সুবিধার নামে বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে অর্থ আত্মসাৎ, আন্তর্জাতিক টেন্ডার চুক্তি, সরকারী ক্রয়, বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ লেনদেন, মুদ্রা পাচার ও হুন্ডি, মাস্তানি/চাঁদাবাজী/ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, সিনেমা তৈরি ও হাউজিং ব্যবসা, চোরাকারবার, সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে আইনের অপব্যবহার, কালোবাজারী, ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি ইত্যাদি।	বিনিয়োগে অস্বাভাবিক মুনাফা, পেশাজীবীদের অতিরিক্ত ফি, পুঁজির অতিরিক্ত আয়, অতিরিক্ত ব্যক্তি আয় ইত্যাদি।

২. **Global Financial Integrity (GFI) এর মে-২০১৭ এর রিপোর্ট** অনুযায়ী ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৯১১ কোটি ডলার পাচার হয়েছে যা টাকায় প্রায় ৭২,৮৭২ কোটি টাকা যা দিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে দুটি পদ্মা সেতু তৈরি করা সম্ভব।

সুতরাং কেবল অর্থ পাচার ঠেকাতে পারলেই মূসক খাতের আয় নিয়ে আদৌ কোনো দুশ্চিন্তা করতে হতো না এনবিআরকে। **২০০৫-২০১৪ এই দশ বছরে** আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে ৭ হাজার ৫৮৫ কোটি ডলার বা ৬ লাখ ৩৭ হাজার ১৪০ কোটি টাকা, যা প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৭.৫ বিলিয়ন ডলার (৬৩,৭১৪কোটি টাকা)। এই অর্থ দিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রায় দুই অর্থবছরের বাজেট তৈরি করতে পারতেন। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ২০১৩ সালে এর পরিমান ছিল সর্বচ্চো যা ৭৭,৬০০ কোটি টাকা (৯.৭ বিলিয়ন ডলার), যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বৈদেশিক অনুদানের ১২গুনেরও বেশি এবং বৈদেশিক ঋণের ১৪১% বেশি। পাচারের এই আশংকাজনক উর্ধ্বগতির কারনে দেশে পরিকল্পিত ও কাংখিত বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সংকট দেখা দিচ্ছে পাশাপশি সরকারও তার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সম্পদ ঘাটতী মোকাবেলা করতে হচ্ছে। *[প্রথম আলো: ০৩/০৫/২০১৭]*

৩. অফশোর ব্যাংকিংয়ের আড়ালে ৩৪০ কোটি টাকা পাচার:

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে মতে, বেসরকারি খাতের এবি ব্যাংকের অফশোর ইউনিটের মাধ্যমে চার বিদেশি কোম্পানির নামে ৪কোটি ২৫লাখ ৪০হাজার ডলার (৩৪০কোটি টাকা) পাচার করেছে। যে উদ্দেশ্যে এসব ঋণ নেওয়া হয়েছিল তা ব্যবহার না করে এই ঋণের অর্থ অন্য হিসাবে সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাচার হয়েছে। ‘পানামা পেপারস’ নামে অর্থ পাচারের যে ঘটনা ফাঁস করা হয়েছে, তা মূলত অফশোর ব্যাংকিং এর মাধ্যমেই ঘটেছে। *[প্রথম আলো: ২৬/০৪/২০১৬]*

৪. বছরে ৩২,০০০কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে বিদেশি কর্মীরা:

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে কমৃরত বিদেশিরা প্রতি বছর দেশ থেকে প্রায় ৪০০কোটি ডলার নিয়ে যাচ্ছেন যা টাকার হিসাবে প্রায় ৩২,০০০কোটি টাকা। এ অর্থ বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্স আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং প্রতি বছর এর পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বর্তমানে 'ওয়ার্ক পারমিট' নিয়ে বৈধভাবে যত বিদেশি কাজ করছেন, তার চেয়ে অবৈধের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি, যার সংখ্যা এক লাখও হতে পারে। অবৈধভাবে অনেক বিদেশি কর্মী বাংলাদেশে কাজ করে কোনো কর পরিশোধ ছাড়া তাদের টাকা অবৈধভাবে নিজ দেশে পাঠাচ্ছেন। মূলতঃ বাংলাদেশে প্রকৌশল, চিকিৎসা, গার্মেন্ট, মার্চেন্ডাইজিং, শিল্প কারখানা ইত্যাদি খাতে বিদেশি পরামর্শকসহ দক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোক কাজ করছেন। বিনিয়োগ বোর্ড এর তথ্য মতে বিদেশিদের জন্য সর্বোচ্চ ০৫ বছর পর্যন্ত ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয়। ভ্রমণ/ব্যবসার ভিসা নিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য অনেকে এদেশে এসে তাদের বড় একটি অংশ কাজ শেষে ফিরছেন না। মূলত তারাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে কাজ করেন এবং তাদের আয়ও করের আওতায় আসছে না। *[সমকাল: ২৭/০৩/২০১৬]*

গ. ব্যাংক লুট, সরকার নীরব ঃ

১. রাষ্ট্রায়াত্ব এবং বেসরকারি ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ: বর্তমান সরকারের আমলে ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত আর্থিক খাতে যতগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে (শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারী, বেসিক ব্যাংক ঋণ কেলেঙ্কারী, জনতা ব্যাংক ঋণ কেলেঙ্কারী, ফারমারস ব্যাংক ঋণ কেলঙ্কারী) তার কোন সমাধান এখন পর্যন্ত হয়নি বা সরকার কোন সমাধান করার আইনী চেষ্টা বা রাজনৈতিক সদিচ্ছা রয়েছে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আর্থিক দূর্নীতি দমনে সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা ও নীতিবহির্ভূত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ২৫-৩০,০০০ কোটি টাকা লোপাট হয়েছে এবং সরকারী হিসাবে শুধু তথাকথিত পরিচালকদের কাছে প্রায় ১,৪৭,০০০ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে যেগুলা আদায় করা যাবে কিনা সন্দেহ।

২০০৯ থেকে ২০১২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত আরেক ব্যাংক বেসিক ব্যাংক থেকে লুট হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪,৩৬৮ কোটি টাকা (৫৬ কোটি ডলার)। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানার জনতা ব্যাংক থেকে ঋণের নামে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা বের করে নিয়েছে ক্রিসেন্ট লেদার নামের একটি প্রতিষ্ঠান। **বর্তমানে জনতা ব্যাংকের মূলধন ৪ হাজার ২৩৩ কোটি টাকা। নিয়ম অনুযায়ী এর সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ অর্থ কোনো একক গ্রাহককে ঋণ দেওয়া যায়। সে হিসাবে ক্রিসেন্ট লেদারকে সর্বোচ্চ ০১ হাজার ৫৮ কোটি টাকা ঋণ দিতে পারে। কিন্তু ব্যাংক এ নিয়ম মানেনি। এর আগে জনতা ব্যাংক থেকে এননটেক্স নামের স্বল্প পরিচিত আরেকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৫ হাজার কোটি টাকা বের করে নেওয়ার তথ্য উদ্ঘাটন হয়।** [আমাদের সময়.কম, ০৬/০৪/২০১৮]

আর এ কারনেই ব্যাংগুলোতে তারল্য সংকট হয়েছে বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া এগুলোতো আসলে জনগনেরই অর্থ (কারন ১,৪৭,০০০ কোটি টাকার মধ্যে পরিচালকদের অর্থ মাত্র ৩,০০০ কোটি টাকা বাকী টাকা জনগনের) আর এ অবস্থায় জনগনের আস্থার জায়গা কোথায় এবং কিভাবে সৃষ্টি হবে?

২. জনগনের করের টাকায় ভর্তুকী:

অর্থমন্ত্রী বলেন জানান, চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত আর তিনটি বেসরকারি ব্যাংকে গত বছরের (২০১৭) সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সাতটি ব্যাংকে মোট মূলধন ঘাটতির পরিমাণ ৯ হাজার ৪১৭ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। মূলধন ঘাটতিতে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি ব্যাংক সোনালী, রূপালী, জনতা ও বেসিক ব্যাংকের ঘাটতি সাত হাজার ৬২৬ কোটি ২৩ লাখ টাকা। আর বেসরকারি তিনটি ব্যাংক কমার্স, ফারমার্স ও আইসিবি ইসলামি ব্যাংকের মোট মূলধন ঘাটতি এক হাজার ৭৯১ কোটি ২০ লাখ টাকা।
‘রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সরকার ১০ হাজার ২৭২ কোটি টাকার পুনঃমূলধনীকরণ সুবিধা দিয়েছে। *[যুগান্তর: ২৪/০২/২০১৮]*

৩. ব্যাংক মালিকদের স্বার্থ রক্ষা :

ক) চলতি বছর জানুয়ারী মাসে আমাদের অর্থমন্ত্রী ব্যাংক কোম্পানী আইন ২০১৮ সংশোধন পূর্বক জাতীয় সংসদে পাশ করিয়ে নিয়েছেন। এই পাশকৃত আইনে বলা হয়েছে বেসরকারী ব্যাংকের পরিচালকহিসাবে এখন থেকে একই পরিবার থেকে দুই জনের পরিবর্তে চারজন পরিচালক থাকতে পারবেন এবং এসকল সদস্য পুর্ববর্তী ছয় বছরের পরিবর্তে নয় বছর পর্যন্ত বোর্ডের পরিচালক হিসাবে ব্যাংক পরিচালনা করতে পারবেন। বেসরকারী ব্যাংক মালিকদের চাপে আমাদের অর্থমন্ত্রী এমন আইন পাশ

করিয়ে নিয়েছেন এখানেউদ্বেগের বিষয় হচ্ছে মাত্র ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে একজন ব্যাক্তি ব্যাংক খাতে উদ্যোক্তা পরিচালক হচ্ছে এবং পরবর্তীতে তার বা তাদের ব্যাংকে জনগনের গচ্ছিত আমানত এই পরিচালকরাই নামে-বেনামে ঋণ গ্রহনের মাধ্যমে আত্নসাৎ করার চেষ্টা করছে এবং আত্নসাৎ করছে, কারন মাত্র ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যদি হাজার কোটি টাকার সুবিধা পাওয়া যায় তাহলে মন্দ কি। সুতরাং আমাদের অর্থমন্ত্রীর এই কথিত ব্যক্তিখাতের প্রনোদনা আসলে দুর্নীতিবাজদেরকেই আর্থিক খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে যার প্রমান হাতেনাতেই দেখতে পাচ্ছি।

খ) অর্থমন্ত্রীর সুস্পষ্ট ঘোষনা থাকার পরও ব্যাংক মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং অনিয়ম ও দূর্নীতি যাতে না ধরা পরে তার জন্য এবার তিনি ব্যাংক কমিশন গঠন করেননি। উপরন্ত ব্যাংকের কর্পোরেট কর ২.৫% এবারের বাজেটে (২০১৮-১৯) এ কমানো হয়েছে। এতে করে ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব কম আসবে, যা মূলত: ভ্যাট ও ব্যক্তি কর বৃদ্ধি করে এই ঘাটতি পূরনের চেষ্টা চলছে।

৪. বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ অর্থ চুরি ও কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা:

গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুইফট কোডের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যাংকে মজুদ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে মোট ১০.১০ কোটি ডলার শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপাইনে পাচার করা হয়। শ্রীলঙ্কায় পাচার হওয়া অর্থ ফেরত পাওয়া গেলেও ফিলিপাইনে পাচার হওয়া ৮.১০ কোটি ডলার (৬৩২কোটি টাকা) লুটেরা নিয়ে যেতে পেরেছে। সরকার এখন পর্যন্ত একাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেনি।

ঘ. বহুজাতিক কোম্পানী প্রকৃত কর দেয়না ঃ

১. **সিম বদলের নামে নতুন সিম বিক্রির** মাধ্যমে ২০১২ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, এয়ারটেল ও রবি প্রায় ৮৮৩ কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে বলে ধারণা করছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ-ভ্যাট)। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে গ্রামীণফোন ৩৭৮ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, তাছাড়া বাংলালিংক দিয়েছে ১৬৮ কোটি ৯১ লাখ টাকা, রবি ২৮৫ কোটি ২০ লাখ টাকা ও এয়ারটেল দিযেছে ৫০ কোটি ২৬ লাখ টাকা। ফোন কোম্পানিগুলো মোটা অঙ্কের ব্যবসা করলেও সরকারের প্রযোজ্য রাজস্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম করছে। এছাড়া সেলফোন অপারেটর রবি আজিয়াটার এয়ারটেলের সঙ্গে একীভূতকরণ ফি, বিভিন্ন ধরনের সেবা ও ইন্টারকানেকশন চার্জের বিপরীতে ভ্যাট বাবদ ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত নতুন করে ৯২৫ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে বলে অভিযোগ এনেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। [যুগান্তর, ২১/১১/২০১৭, বণিকবার্তা, ০৬/১১/২০১৭]

২. **গ্রেট ওয়াল সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** গত ছয় বছরে প্রায় ৪৭১ কোটি টাকার পণ্য বিক্রির তথ্য লুকিয়েছে রাজস্ব ফাকি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ড় ১ হাজার ৮২৬ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করলেও ১ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা বিক্রির তথ্য প্রদর্শন করে সরকারকে বড় অংকের রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে বলে অভিযোগ করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। [বণিকবার্তা, ১৭/০৫/২০১৮]

পাশাপাশি **বেসরকারি সংস্থা ব্রাক এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ফ্যাশন শিল্প আড়ং** বিক্রয়ের বিপরীতে সঠিকভাবে মূসক পরিশোধ না করে এবং ক্রয়কৃত পন্যমজুতের বিপরীতে প্রায় ১৫ কোটি টাকা ভ্যাট ফাকি দিয়েছে। অর্থাৎ জনগনের কাছ থেকে কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারের কোষাগারে জমা হচ্ছে না, ফলে সারকার বিপুল অংকের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। **[শেয়ার বিজ, ০৫/০৬/২০১৮]**

৩. ঠিক একইভাবে **“ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিঃ (বিএটিবি)”** যুক্তরাজ্যে অবস্থিত বিএটি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের কাছ থেকে কারিগরি ও পরামর্শসেবা নিয়ে থাকে এবং এ সেবার নামে ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের মাধ্যমে প্রতি বছর বড় অংকের অর্থ হোল্ডিং কোম্পানিতে পাঠাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। গত নয় বছরে এ ধরনের সেবার ফি বাবদ ৬১৫ কোটি টাকার বেশি সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ করেছে বিএটিবি। অর্থাৎ কারিগরি ও পরামর্শ ফি বাবদ প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৭০ কোটি টাকা পরিশোধ করছে প্রতিষ্ঠানটি। এর পূর্বেও কোম্পানীটি তাদের দু'টি ব্র্যান্ডের সিগারেটে মূল্যস্তরে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ১,৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়। সরকার এদেরকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ কর আদায় হতো, ফলে ভ্যাটের মত পরোক্ষ করের উপর সরকারকে এতটা নির্ভরশীল হতে হতো না। [বণিকবার্তা, ১৩/১১/২০১৬]

ঙ. আমাদের প্রস্তাবনা ঃ

১. হলমার্ক, বিসমিল্লা গ্রুপ, ক্রিসেন্ট রেদার, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত্ব ও বেসরকারি ব্যাংক সহ শেয়ার বাজার কেলেংকারীর আত্নসাতকৃত টাকাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির উপর তদন্ত কমিশন ও শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা সহ ব্যাংক গুলোকে বাচানোর জন্য শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ ব্যাংক কমিশন চাই।

৩. রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট ও ব্যক্তিকর আদায়ের উপর চাপ কমিয়ে কর্পোরেট কর আদায় এবং কালো টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। মধ্যবিত্তদের উপর করের বোঝা না চাপিয়ে উচ্চবিত্তদের কাছ থেকে কর আদায় করা। ব্যক্তিশ্রেনীর করমুক্ত আয়সীমা ২,৫০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩,৫০,০০০ এ নিয়ে যাওয়া এবং প্রথম স্তরের করহার ১০% না করে ৭% করা।

৪. বহুজাতিক কোম্পানি গুলো বিভিন্ন পন্থায় প্রকৃত আয় গোপন করে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে। বিশেষ করে মিস ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে অর্থ পাচার করে থাকে। এই কোম্পানি গুলো দেশে কত টাকা বিনিয়োগ বা আয় করলো তা অডিট করে এর রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। সরকার এক্ষেত্রে ট্রান্সফার প্রাইসিং আইন করেছে এবং একটা ইউনিট স্থাপন করেছে, যার প্রধান কাজ হচ্ছে উপরোক্ত বিষয়গুলো উদঘাটন করা। আমরা এই ট্রান্সফার প্রাইসিং ইউনিটের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জানতে চাই।

৫. বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন দেশে যেসব বাংলাদেশী নাগরিক নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের সকল অর্থনৈতিক তথ্য পরীক্ষা করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

৭. পানপমা পেপারস-এ যেসব বাংলাদেশীদের নাম এসেছে, তাদের ব্যাপারে তদন্ত ও শ্বেতপত্র চাই।

৮. আইনগত শাস্তির বিধান রেখে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে। কোন সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠালে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

৯. সকল ক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতির পূর্ন বাস্তবায়ন চাই।

১০. বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের পথ অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন,

- ➢ ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার PIN ব্যবহার এবং এ ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনও নিষিদ্ধ করা
- ➢ ধরা পড়লে বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা

১১. সবার উপর দেশের সকল রাজনৈতিক শক্তিকে একটি ন্যুনতম সমঝোতা করতে হবে, যাতে দেশের পুজি ও কষ্ট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা (যা মূলত আয় হয় বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিক এবং দেশে গরীব গার্মেন্টস শ্রমিক হতে) পাচারে কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হয়। আর্থিক খাত তথা ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ করে পাবলিক ব্যাংকিং সেক্টরে জনগনের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করতে হবে। সবার উপরে আমরা বিশ্বাস করি যে, সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি (পরস্পরকে নি:শেষ করে দেবার রাজনীতি) পরিহার করে সবার ভেতরে বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ভেতরে পূর্ণ নিরাপত্তা, মর্যাদাপূর্ণ আচরন ও আইনের শাসনের প্রতি পূর্ণ আস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ দেশের অর্থ যেন বিদেশে স্থানান্তর না হয় সে জন্য দেশের ভেতরে বিনিয়োগবান্ধব ও শান্ত রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার পরিবেশ স্থাপন করতে হবে।

১২. সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির অপরিহার্য অংশ গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে, বিশেষ করে গনমাধ্যম, নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বধীন ও শক্তিশালীভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে আইনের শাসন কায়েম কতে হবে।

১৩. সরকার বিগত কয়েক বছর পূর্বেই একটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রনয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রের মূল লক্ষ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সকল স্তরকে দূর্নীতি মুক্ত করা। আমরা মনে করি তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এবং এর আলোকে সরকারের সকল বিভাগ, মন্ত্রনালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহে সংশ্লিষ্ঠ শুদ্ধাচার কৌশল প্রয়োগ ও বাস্থবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. বিদেশীদের চাপে ভর্তুকি না কমিয়ে সরকারী বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ঘাটতি সমন্বয় করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করার জন্য "Public Expebditure Review Commission" করতে হবে এবং সে অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে হবে।

সহ-আয়োজক: অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পন, অন্তর, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, ডোক্যাপ, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, প্রান্তজন, পিএসআই, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, লেবার রিসোর্স সেন্টার, মুক্তির ডাক, সংকল্প ট্রাস্ট, সংগ্রাম, সিডিপি